Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 161 – 169
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

বরাক উপত্যকার নির্বাচিত ছোটগল্পের বহুস্বরিক পাঠ

প্রিয়া পাল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর
Email ID : paulshika9085@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
Barak Velly, Silchar, Story, Punoray, Ettarbanu, Pata Bibi, Sotocrotu Potrika, Storytelling.

Abstract
The history of Barak Valley is extensive in Bengali literature. Barak Valley is constituted by three districts namely Cachar (Silchar), Hailakandi and Karimganj. It is observed that the main stream Bengali literature are different from the literature of North-Eastern region or Barak Valley literature due to the Socio-economic, Political and Geographical differences. Looking back at the history, it seen that the literary practice of Barak Valley introduced in 1957 with the magazine 'Sambhar'. Later the magazine did not expand as much. After that, Barak's story was enriched in the world by sheltering magazines like 'Anish', 'Shatkratu', 'Sahityater Navaparjaya', 'Udark', 'Unmochan', 'Swapneel', etc. Barak's literature was not only published in newspapers, it also published in many little magazines such as 'Angikar', 'Sapath', 'Belabhoomi', 'Amader Somoykal', 'Khelaghar'. In this essay I have discussed the story namely 'Akti Mrityu and tarpor' by Shyamalendu Chakraborty, 'Manush' by Badruzzaman Choudhury and 'Ettarbanu and Mass Media' by Krishna Misra Bhattacharya. The story 'Akti Mrityu and tarpor' revolves around a dying person. Similarly, in the story 'Manush', the starving exploited people protest against the exploiting class and in the story 'Ettarbanu and Mass Media', the story of the rape of a raped girl was aired in the media, but no women's organization came to her rescue. Ettarbanu has represented us in the women's society. I have discussed this story in detail in the full paper.

Discussion
বাংলা সাহিত্যে বরাক উপত্যকার ইতিহাস বহুবিস্তৃত। কাছাড় (শিলচর), হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ এই তিন জেলা নিয়ে বরাক উপত্যকা। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ভূগোল আকরনের ভিন্নতায় বাংলা সাহিত্যের মূল ধারার সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাহিত্য তথা বরাক উপত্যকার সাহিত্যের কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সম্প্রতি বরাক নামটি 'ব্রা' এবং 'ক্রো' শব্দ দুটি থেকে আগত। অর্থের দিক থেকে দেখা যায় 'ব্রা' মানে বিভক্ত হওয়া এবং 'ক্রো' অর্থাৎ উপরের অংশ। করিমগঞ্জ জেলার সন্নিকটে উপস্থিত সুরমা নদী এবং কুশিয়ারা নদীটি বিভক্ত হয়ে পরিণত হয়েছে কাছাড়ের বরাক

নদীতে। বিভাজিত এই নদীর স্রোতশাখাকে স্থানীয় লোকেরা উচ্চারণ করত 'ব্রাক্রো' নামে। উচ্চারণের বিকৃতির জন্য বহুকাল ধরে 'ব্রাক্রো' নামটি পরিবর্তিত হয়ে 'বরাক' নামে পরিণত হয়েছে।

বরাক উপত্যকার সাহিত্য বিকশিত হয়েছিল অনেকটা ধীরলয়ে। বহু চড়াই-উৎরাই পার হয়ে বরাক উপত্যকার সাহিত্যকে নিয়ে কাব্য আন্দোলন সফল হলেও গদ্য আন্দোলন তেমন ভাবে প্রাণপ্রতিষ্ঠা পায়নি। কিন্তু বিক্ষিপ্তভাবে অল্প প্রচারিত স্কুল-কলেজ ম্যাগাজিন ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কিছু ছোটগল্প প্রকাশিত হলেও তার প্রাথমিক ভিত্তি তৈরি হয়েছিল ১৯৫৭ সালে শিলচর থেকে প্রকাশিত সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ক 'সম্ভার' পত্রিকা। দশ বছর অর্থাৎ ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত তৎকালীন সময়ের বিভিন্ন গল্পসম্ভার নিয়ে প্রকাশিত হয় এই পত্রিকাটি। 'সম্ভার'কে কেন্দ্র করে বরাক উপত্যকার গল্প আন্দোলনের সূত্রপাত হলেও তা তেমন ভাবে প্রসার লাভ করেনি। এই পর্বের গল্পকাররা হলেন - গনেন্দ্র চক্রবর্তী, ভানু সেনগুপ্ত, অতীন দাশ, গণেশ দে, গোলাম ওসমানি, শঙ্কর গুপ্ত, অপরেশ ভৌমিক, কমলেন্দু ভট্টাচার্য প্রমুখ। পরবর্তীতে ১৯৬৯ সালে শ্যামলেন্দু চক্রবর্তীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'অনিশ' পত্রিকা। 'অনিশ' পত্রিকাকে আশ্রয় করে আঙ্গিক-প্রকরণের দিক থেকে বরাক উপত্যকার গল্পশৈলী গদ্য স্টাইলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। তপোধীর ভট্টাচার্য, শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী, মিথিলেশ ভট্টাচার্য, অরিজিৎ চৌধুরী, রণবীর পুরকায়স্থ প্রমুখ সাহিত্যিকদের হাত ধরে 'অনিশ' পত্রিকার সাহিত্য সম্ভার বিকশিত হতে থাকে। কোনো কারণবশতঃ ১৯৭২ সালে পত্রিকাটির প্রকাশ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ১৯৭৩ সালে 'অনিশ' পত্রিকা পূর্ণবিকাশ পায় গল্পপত্রিকা 'শতক্রতু' প্রকাশের মাধ্যমে। প্রথমদিকে 'শতক্রতু'র যৌথ সম্পাদক ছিলেন মিথিলেশ ভট্টাচার্য এবং ভাস্করানন্দ শর্মা (তপোধীর ভট্টাচার্য)। সমালোচকের ভাষায়, 'শতক্রতু' এ অঞ্চলের কথা-সাহিত্যের জগতে ল্যাণ্ডমার্ক। বিশেষত বাংলা গল্পে নতুন শৈলী, আঙ্গিক প্রকরণে বহুবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, এ সমস্তই 'অনিশ'-এ যার অংকুরোদ্গম হয়েছিল, 'শতক্রতু'তে এসে তার পূর্ণপ্রকাশ ঘটে। অমলেন্দু ভট্টাচার্য, শেখর দাশ, বিজয় দেবরায়, কৃষ্ণা মিশ্র, শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী, রণবীর পুরকায়স্থ, মিথিলেশ ভট্টাচার্য, প্রমুখ শক্তিমান লেখকদের হাত ধরে বরাক উপত্যকার গল্প চর্চার ইতিহাস সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। এছাড়া 'সাহিত্যের নবপর্যায়', 'উদর্ক', 'উন্মোচন', 'স্বপ্নীল' ইত্যাদি পত্রিকাকে আশ্রয় করে যেমন সমৃদ্ধ হয়েছে বরাকের গল্পবিশ্ব, তেমনি 'অক্ষরবৃত্ত', 'পরম্পরা', 'প্রতিস্রোত' ইত্যাদি বর্তমানের অনেক ছোট-বড় সাহিত্য পত্রিকাকে আশ্রয় করে বরাক উপত্যকার গল্পবিশ্ব প্রসারিত হতে থাকে।

সাতের দশকের অন্তিমলগ্ন থেকে আট ও নয়ের দশকে বরাক উপত্যকায় বহু সাহিত্য রচিত হয়েছে। এই সময়ে সাহিত্য আন্দোলন গ্রামাঞ্চলে ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করে এবং তৎসঙ্গে প্রকাশিত হয় অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিন। এই সময়পর্বে প্রকাশিত 'অঙ্গীকার', 'শপথ', 'বেলাভূমি', 'আমাদের সময়কাল', 'কলিযুগ', 'খেলাঘর', 'অনির্বানশিখা', 'চম্পাকলি', 'প্রবাহ', 'দিগ্বলয়', 'স্বদেশ', 'বর্ণিকথা' ইত্যাদি পত্রিকায় বহু গল্পচর্চা হয়েছে। এছাড়াও বরাক উপত্যকায় আছে বিখ্যাত অনেক গল্পকারদের ব্যক্তিগত ও যৌথ গল্পগ্রন্হ। যেমন, অরিজিৎ চৌধুরীর 'পু ঘোষ' (২০০৩), কৃষ্ণা মিশ্র ভট্টাচার্যের 'সাপ শিশির খায়' (১৪১০), ছবি গুপ্তার 'গল্পওয়ালা' (দ্বিতীয় খন্ড) (১৯৮৬), তনুশ্রী ঘোষের 'দামাল মনের সাতকাহন' (২০০৬), বদ্‌রুজ্জামান চৌধুরীর 'লাখ টাকার মানুষ' (১৪১০), মিথিলেশ ভট্টাচার্যের 'কক্ষপথ' (২০০৩), 'আত্মকথা' (২০১২) এবং 'চৈত্রপবনে', রণবীর পুরকায়স্থের 'বোকা কাশীরাম কথা' (২০০১) ও 'আসমান জমিন কথা' (২০১১), শেখর দাসের 'কোষাগার' (২০০২), শ্যামলেন্দু চক্রবর্তীর 'যে গল্পের শেষ নেই', স্বপ্না ভট্টাচার্যের 'সমান্তরাল' (২০০৫)।

বরাক উপত্যকার শিলচরের শুভম প্রকাশনী থেকে 'গল্প পঞ্চদশী' (১৯৯৭) নামক গল্পগ্রন্থতে এক সময় মোট পনেরো জন নারী লেখিকাদের গল্প প্রকাশ হয়। এই পনেরো জন নারী গল্পকাররা হলেন মহুয়া চৌধুরী, দীপালি দত্ত, জয়া দেব, দীপ্তি দেব, ঝুমুর পাণ্ডে, নিবেদিতা চৌধুরী, অর্চনা পুরকায়স্থ, বিজয়া দেব, বিজয়া কর, জ্যোৎস্না হোসেন চৌধুরী, শিবানী ভট্টাচার্য, কৃষ্ণা চৌধুরী, কাজল দেমতা, হাসনা আরা শেলী এবং অনামিকা চক্রবর্তী। গল্পগ্রন্থটি সম্পাদনা করেন অনন্ত দেব, মৃণালকান্তি দত্তবিশ্বাস, ইমাদ উদ্দিন বুলবুল, তৈমুর রাজা চৌধুরী ও মিলন উদ্দিন লস্কর। তাছাড়াও

বরাক উপত্যকার শ্রেষ্ঠত্বের আসনে দাবিদার মহিলা গল্পকাররা হলেন শুক্লা ভট্টাচার্য, দীপ্তি চক্রবর্তী, শর্মিলা দত্ত, চন্দ্রিমা দত্ত প্রমুখ।

বরাক উপত্যকার গল্পচর্চার ইতিহাসে প্রচুর উৎকৃষ্টমানের গল্প গল্পকারদের কলমে ফুটে উঠেছে। প্রতিটি লেখকেরা নিজ নিজ শিল্প কুশলতায় গল্প নির্মাণ করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে বরাক উপত্যকার নির্বাচিত গল্পের বহুস্বরের বিভিন্ন আদল নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

বরাক উপত্যকার উজ্জ্বল নক্ষত্রদের মধ্যে অন্যতম হলেন শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী। 'অনিশ' (১৯৬৯) পত্রিকার স্রষ্টা গল্পকার শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার গোলাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। শিলচর শহর থেকে তাঁর বেড়ে ওঠা। পেশায় শিক্ষকতার সাথে নিযুক্ত ছিলেন। চল্লিশ বছরের সাহিত্যচর্চায় তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন 'গ্রন্থি', 'অক্টোপাশ' এর মতো মূল্যবান গল্প। তাঁর একমাত্র গল্পগ্রন্থ 'যে গল্পের শেষ নেই' প্রকাশিত হয় ২০১০ সালে। দীর্ঘদিন তিনি 'বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন' কমিটির সভাপতিত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন। শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মার্চ ইহলোক ত্যাগ করেন।

শ্যামলেন্দু চক্রবর্তীর গল্পের প্রধান গুণ নাটকীয়তা। তাঁর বিভিন্ন গল্পে নাটকীয় প্রভাব লক্ষ করা যায়। আলোচ্য 'একটি মৃত্যু এবং তারপর' (১৯৭৫) গল্পের কাহিনি স্বল্প কিন্তু একটি মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন চরিত্রের সমাগম ও সংলাপ একটি নাটকীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। চরিত্রগুলোর মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায় না। গল্পে একটি মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে বাকী চরিত্রগুলো অগ্রসর হয়েছে। তাঁর গল্প পড়ে মনে হয় সর্বদা তিনি যেন কাহিনিকে অতি দ্রুত পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই প্রসঙ্গে কোন এক সমালোচক বলেন, 'তাঁর গল্প পড়লে মনে হয় অন্য কোন কাজে তিনি ব্যস্ত, গল্পের জন্য, তাঁর নির্মাণে যথেষ্ট শ্রম দিতে তিনি প্রস্তুত নন'। পরবর্তীতে এই সমালোচকই আবার বলেন, 'শ্যামলেন্দুর গল্প হেলাফেলার নয়'। শ্যামলেন্দুর গল্পে বাস্তবতা লক্ষ করা যায়। গল্পে কোন বাড়বাড়ন্ত নেই। অতি সংক্ষেপে নাটকীয়ভাবে গল্পের মূল ঘটনাকে নিজস্ব শৈল্পিক দক্ষতায় পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন গল্পকার শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী।

'একটি মৃত্যু এবং তারপর' গল্পটি একটি মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে নির্মিত। মৃত ব্যক্তিটি একসময় ছিল দুর্দান্ত খুনি এবং স্মাগলার। পুলিশি তদন্তের পর তাকে পাওয়া যায় মৃত অবস্থায়। গল্পে তার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এখনো আসেনি। এই খুনি বা স্মাগলার কখনো জগু, কখনো বা রকেট, নিসার বা লক্ষণ নামে লোকমুখে প্রচলিত। গল্পের প্রথমেই মৃত ব্যক্তি অর্থাৎ কাহিনির মুখ্য চরিত্রের বর্ণনা নাটকীয়ভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন গল্পকার -

> "লোকটা সটান শুয়ে আছে। মুখ অল্প হাঁ করা। হয়তো শেষ দম মুখ দিয়েই টেনেছিল। এখন ও পথে বাতাসের আনাগোনা নেই। পরিবর্তে কয়েকটি মাছি নিশ্চিন্তে যাওয়া-আসা করছে।"[১]

এই খুনি লোকটিকে কেন্দ্র করে গল্পের বাকি চরিত্রগুলো আবর্তিত হয়েছে। 'এমন সময় মাছি যেমন গন্ধে উড়ে আসে, কুকুর যেমন গন্ধ শুঁকে হাজির হয়, তেমনি কয়েকটি লোক মৃতের ঘরে নিঃশব্দে ঢোকে'। ঢুকে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর একজনের মধ্য থেকে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। এরপর একজন ট্রাঙ্কটি খাঁটের নীচ থেকে বের করে আনতেই বাকি লোকগুলো এমন ভাবে হুঁমড়ি খায় যেন অলৌকিক কিছু বেরিয়ে আসবে। দু-তিনটি ইস্ত্রি করা শার্ট-প্যান্ট, একটা খাপ-সুদ্ধ ছোরা ছাড়া আর কিছুই নেই দেখে লোকগুলোর মুখে আশাভঙ্গের ছাপ। এরপর ট্রাঙ্কটি যথাস্থানে রেখে লোকগুলো বেরিয়ে যায়। নিস্তব্ধ ঘরের প্রতিটি দিকে টিকটিকি ও কালো ভোমরা পোকা নিজস্ব কাজে ব্যস্ত। দীর্ঘ নীরবতার পর একটি মেয়ে হঠাৎ ঘরে ঢুকে সোজা চৌকির দিকে এগিয়ে যায়। মেয়েটির হাবভাব দেখে স্পষ্ট হয় যে লোকটির সাথে পূর্ব পরিচিত ছিল। মেয়েটি সোজা মৃত ব্যক্তির শিয়রের কাছে থাকা বালিশের নীচে হাত ঢুকিয়ে ব্যর্থতার ছাপ নিয়ে পুনরায় বালিশের নীচ থেকে হাত বের করে আনে। তার কার্যকারিতা থেকে বোঝা যায় মেয়েটি কোনো কিছুর সন্ধান করছে। পুনরায় সে তোশকের নীচ থেকে আবিষ্কার করে দুটো আনকোরা দশ টাকার নোটের বান্ডিল। এক ঝটকায় মেয়েটি লুটিয়ে পড়া শাড়ির আঁচল কাঁধের দিকে চালান করে টাকার বান্ডিল নিয়ে তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

রাস্তায় একটি লোকের সঙ্গে বাক্যালাপে জানা যায় মেয়েটির নাম ঝুমকি। লোকটির সাথে মেয়েটির অস্থির ও কুরুচিপূর্ণ কথাবার্তায় ঝুমকির আসল পরিচয় আমরা সহজেই আন্দাজ করে নিতে পারি।

কিছুক্ষণ পর একটি চার-পাঁচ বছরের ছেলে ভেজানো দরজা দিয়ে মৃতের ঘরে ঢোকে। বিছানার কাছে গিয়ে মৃত লোকটিকে 'কাকু' বলে সম্মোধন করে ও তার কাছ থেকে চকোলেট চায় আবার শিশুটির মধ্যে গভীর ভীতি কাজ করে, যে ছেলেটি চকোলেট নিতে এসেছে এই কথাটি তার মা জানতে পারলে মা মারবে। সাড়া না পেয়ে ও টেবিলের উপর চকলেট না পেয়ে অভিমানসূচক মুখ নিয়ে টুকটুক পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় শিশুটি।

বিষন্ন দ্বিপ্রহরের শীতকালীন শুকনো বাতাস আধখোলা জানালা দিয়ে ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করে। মাঝে মাঝে ঘুঘু, টিকটিকি 'সত্য-সত্য-সত্য - মৃত্যু-মৃত্যু-মৃত্যু' চিরকালীন শব্দ জানিয়ে যায়। এভাবেই বিকেল থেকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। রাত যখন ক্রমশ একটু একটু করে গাঢ় হতে শুরু করে ঠিক তখনই একজন 'ধোপ-দুরস্ত জামা-কাপড়' পড়া ভদ্রলোক চারিদিক পর্যবেক্ষণ করে ঘরের মধ্যে ঢুকে চাপা গলায় শায়িত লোকটির উদ্দেশ্যে বলেন -

> "জগু, অ্যাই জগু-জলদি ওঠ-আজ একটা মাল ডেলিভারি দিতে হবে। আজ মোটা বকশিস পেয়ে যাবি-পাঁচশ।"[২]

শায়িত লোকটির কোন সাড়া না পেয়ে যে কোন উপায় তাকে দিয়ে কাজ সিদ্ধি করানোর জন্য লোকটি শেষ পর্যন্ত তাকে হাজার টাকা দিবে বলে জানান। লোকটি সেইসঙ্গে তাকে সতর্কবার্তা দেন কারণ 'পেছনে গোবরার দল লেগে আছে - দরকার হলে সাবড়ে দিস'। কিছুক্ষণ পর লোকটি আবারও কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে পকেট থেকে পেন্সিল টর্চ বের করে জগুর মুখে আলো ফেলতেই চমকে উঠেন। এরপর তৎক্ষণাৎ আলো নিভিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। ভদ্রলোকটি এরপর সামনের ঔষধের দোকান থেকে থানায় ফোন করে মৃত সম্বন্ধে জানিয়ে কী যেন ভাবতে-ভাবতে অন্তর্ধান হন।

ভদ্রলোকটি ফোন করার পর জগুর ঘরের সামনে পুলিশের জিপ আসে। চারজন কনস্টেবল ও একজন এস. আই. ঘরের দিকে অগ্রসর হন। দুজনকে বাইরে দাঁড় করিয়ে ভেতরে ঢোকেন এস.আই.সহ তিনজন। টর্চের আলোয় ঘরে চতুর্দিক দেখে নেন। মৃতের মুখের দিকে আলো পড়তেই এস.আই. জগুকে চিনে ফেলেন। এরপর মৃতকে মেঝেতে নামিয়ে ঘরের আসবাবপত্র নিখুঁত ভাবে সার্চ করার পর চৌকিতে তালা লাগাবার দুটো কড়া ধরে টান দিতেই একটি বড় আকারের খোপ এস. আই. -এর চোখে পড়ে। এতে দশ টাকার কয়েক নোটের বান্ডিল এবং কয়েকটি মূল্যবান জিনিসপত্র সযত্নে রয়েছে। তিনজন লোক হতভম্ব হয়ে পরস্পর একে অন্যকে দেখতে থাকে এবং কিছুক্ষণ পর মৃতদেহকে মর্গে পাঠিয়ে পুলিশ থানায় এসে ঘন্টা দুয়েক ধরে রিপোর্ট লিখতে থাকেন। পুলিশি তদন্তের পর জানা যায় মৃতের ঘরে ছিল -

> "একটা তোশক, দুটো বালিশ, একটি মশারি, একটি ট্রাঙ্ক, তিন প্রস্থ জামা-প্যান্ট, একটা ছোরা, একটা কাঁচের গ্লাস, একটা কোপ, নগদ ছাব্বিশ হাজার টাকা বিরানব্বই পয়সা।"[৩]

এখানেই গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটে।

'একটি মৃত্যু এবং তারপর' গল্পের কয়েকটি স্তবকে নাটকীয় মুহূর্ত আমরা দেখতে পাই। দেখতে পাই, যখন -

> "ঘরের ভেতরে একটা কাত হয়ে থাকা মোরা, যার কিছু শলা চুলের কাঁটার মতো বেরিয়ে আছে। একটা নড়বড়ে এখানে-ওখানে পোকায় কাটা টেবিল। টেবিলের উপর একটা হাতলভাঙ্গা কাপ, একটি কাঁচের গ্লাস, গোটা কয়েক পুরানো সিনেমা ও যৌনপত্রিকা বিশৃঙ্খল পড়ে আছে। দেয়ালে একটি মাত্র ক্যালেন্ডার তাও দু-তিন বছর আগের। জানুয়ারি মাস থেকেই ওটার পাতা ছেঁড়া হয়নি। এ সমস্তের মধ্যে চৌকিটাই যা একটু শক্ত। চৌকির নীচে ট্রাঙ্ক। চকচকে।"[৪]

তখন মনে হয় যেন কোন মঞ্চ নাটক আমাদের চোখের সামনে সুসজ্জিত। গল্পকার মৃত ব্যক্তির আসল পরিচয় স্পষ্ট করলেও তার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে পাঠকের কাছে স্পষ্ট করেন নি। তাই গল্পটি তেমন ভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। বরাক উপত্যকার ইতিহাসে 'একটি মৃত্যু এবং তারপর' গল্পটি বরাকের একটি দলিল মাত্র।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বরাকের গল্পকারদের মধ্যে অন্যতম হলেন বদ্‌রুজ্জামান চৌধুরী। দরিদ্র যন্ত্রণাদীর্ণ মুসলমান সমাজের করুণ কাহিনি তাঁর সাহিত্যের মূল উপজীব্য বিষয়। তাঁর গল্পে বেশিরভাগ মুসলমান চরিত্রদের আনাগোনা লক্ষ করা যায়। 'বদ্‌রুজ্জামান সেই সব গল্পকারদের একজন নন যাঁরা কেবল জীবনের আলোকিত দিককে আলোকিত করার চেষ্টা করেছেন। বরাক উপত্যকার মুসলমান সমাজ, তার সংস্কার, কুসংস্কার, গ্রামের অশিক্ষিত অল্প শিক্ষিত মুসলমান নারী পুরুষের ব্যথা ও বেদনার কাহিনি তিনি যে ভাবে গল্পে নিয়ে এসেছেন তা বাংলা সাহিত্যে, আমাদের এ দেশের বাংলা সাহিত্যে এক নতুন অভিজ্ঞতা। ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বদ্‌রুজ্জামান যে সব গল্প লিখেছেন তাতে তাঁর কব্জির জর, অসীম সাহসেরও পরিচয় মেলে। বিষয় নিরাপদ নয়, সমাজ ধর্মান্ধ, কিন্তু বদ্‌রুজ্জামান অকুতোভয়'। এই ভাবেই অগ্রজদের কাছ থেকে বদ্‌রুজ্জামানের আসল পরিচয় মেলে।

লেখক বদ্‌রুজ্জামান চৌধুরী করিমগঞ্জ জেলার বদরপুরের কাছে মালুয়া গ্রামে ১৯৪৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামেই তিনি বেড়ে ওঠেন এবং পরবর্তীতে তিনি শিক্ষকতার পেশায় নিযুক্ত হন। সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে তাঁর বাস এবং গ্রামের অবহেলিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষকে নিয়েই তাঁর সাহিত্যচর্চার প্রেক্ষাপট। বদ্‌রুজ্জামান চৌধুরী রচিত ১৯৭৮ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে সংগৃহীত ১৮টি গল্প নিয়ে 'লাখ টাকার মানুষ' গল্পগ্রন্থটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গল্পগুলি হল – 'জানোয়ার', 'পরবাস', 'ঘুমানো', 'কবিতা শরীরে', 'আমরা সবাই ভালো আছি', 'অশ্লীল', 'প্রতিরোধ ক্রমশ স্তব্ধ', 'ফুলজান বিবির কথামালা', 'মানুষ এখনো মানুষ', 'কেচ্ছা', 'বিসর্জন', 'জাত বেজাতের কল্প কথা', 'বহু বল্লভা', 'উপলব্ধি', 'শব্দ নাহি', 'একখানা জীবনীর প্রথম অধ্যায়', 'লাখ টাকার মানুষ', 'অন্নদাত্রী'। তিনি তাঁর শিল্পদক্ষতায় প্রচুর সম্মাননা পেয়েছেন। যার মধ্যে কয়েকটি হল – 'ছোটগল্পে সোনার কাছাড় পদক প্রাপ্তি', ১৪/০৮/৮০; 'গুণিজন সংবর্ধনা', ঝিনুক সাংস্কৃতিক সংস্থা, বদরপুর ৯ ফা : ১৩৯৩; 'গুণীজন সংবর্ধনা', লিটলম্যাগ লটারারি ক্লাব, শিলচর ১৪/১১/১৪০০; 'গুণীজন সংবর্ধনা', করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসন, ২৬/০১/২০০০। এছাড়া এই অঞ্চল থেকে প্রকাশিত 'বরাক পারের গল্প' (শিলচর), 'বরাক উপত্যকার নির্বাচিত গল্প' (করিমগঞ্জ), 'উত্তর পূর্বের নির্বাচিত গল্প' (আগরতলা), 'অসীমান্তিক' (আগরতলা) গল্পগ্রন্থগুলোতে লেখকের বহু গল্প রয়েছে।

বদ্‌রুজ্জামান চৌধুরীর 'লাখ টাকার মানুষ' গল্পগ্রন্থের অন্যতম গল্প 'মানুষ' (১৯৮২)। গল্পের বিষয়বস্তু অত্যন্ত মর্মান্তিক। গ্রামীণ দরিদ্র ক্লীষ্ট নিপীড়িত মানুষের জীবনযাপনের চিত্র আমরা 'মানুষ' গল্পটিতে দেখতে পাই। দরিদ্র রাজ্জাক ও তার স্ত্রী পাতা বিবি ও তাদের এগারো বছরের কন্যা এবং ছয় ও তিন বছরের দুটি ছেলেকে কেন্দ্র করে গল্পের কাহিনি গঠিত। সংসারে খাদ্যাভাব দেখা দিলে তিনটি সন্তানকেই ভিক্ষা করতে পাঠাতে বাধ্য হয় রাজ্জাক ও পাতা বিবি। দেখা যায় সংসারে খাদ্যসংস্থান না জুটলেও পাঁচটি সন্তানকে জন্ম দিতে তারা কুণ্ঠা বোধ করেনি। গল্পে দেখা যায়,

> "তিনটে বাচ্চা ভিক্ষা করতে বাইরে গেছে, চতুর্থটা গোরে গিয়েছে। এই পঞ্চমটা হয়তো যাবে। কুড়ি দিনের পোয়াতি পাতা বিবিকেও প্রায়দিন উপোস দিতে হয়। বাচ্চাটা এখন আর 'মাই' টানতে চায় না। পেটভর্তি জল থাকলে বুকে রস আসে কোত্থেকে?"[৫]

গতবছর অনাবৃষ্টির ফলে মাঠের ফসল শুকিয়েছে। তাই ভিক্ষা মেলা ভার। বাচ্চারা প্রায় দিনই খালিহাতে বাড়িতে ফেরে। তবুও প্রতিদিন পাঠাতে হয় ক্ষুধার তাগিদে সেই আশায় যে যদি বাচ্চাগুলোকে কেউ দয়া করে দুটো ভাত দেয়।

রাজ্জাক আগে রিকশা চালাত কিন্তু বর্তমানে যক্ষা রোগে আক্রান্ত হওয়ার দরুণ সে আর কাজ করতে পারে না। কোলের শিশুটি মাতৃদুগ্ধের অভাবে প্রাণ থাকলেও নড়াচড়া নেই বললেই চলে। অর্থাভাবে শিশুটির চিকিৎসা

করানোর মতো সামর্থ্যও তাদের নেই। 'কুড়ি দিনের পোয়াতি' পাতা বিবি অনেকদিন খেতে পাই নি। জলভর্তি পেটে দুধের সন্তানটির জন্য বুকের দুধ পর্যন্তও নেই। সন্তানগুলো পাতার বুকের পাঁজর। যৎসামান্য ঘরে থাকা ভাতের ফ্যান নিজে না খেয়ে সন্তানগুলোকে খেতে দেয় সে। পাতা বিবির খুব কষ্ট হয় যখন-

> "সমস্ত দিন রোদে হেঁটে হেঁটে বাচ্চাগুলোর বেহালের সীমা থাকে না। তিন বছরের ছেলেটা বেশি হাঁটাহাঁটি করতে পারে না। মেয়েটা এগারোয় পড়েছে এবার। সে ওকে কোলে করে হাঁটে। বছর ছয়ের ছেলেটাও খালি পেটে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আজ সে বেরোতে চায় নি। তার পায়ে ব্যথা হয়েছে। সে হাঁটতে পারবে না। পাতা প্রথমে তাকে বুঝিয়েছে। ফেনের পরিমাণ একটু বাড়িয়ে খাইয়েছে। তবুও ছেলে রাজি না হওয়াতে দু'টো চড় দিয়েছে।
>
> নবাবের ব্যাটা, হাঁটতে পারবে না। হাঁটতে পারবি না তো খাওয়া বন্ধ কর। তা'নয়, গর্তটা শুধু হাঁ করেই আছে, ভর্তি হয় না।"[৬]

খাদ্যাভাবে পাতা বিবির চতুর্থ সন্তান মারা গেছে, কনিষ্টতা ও মৃত্যুমুখী। অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান ছাড়া মনুষ্য জীবন প্রায় অচল একথা পাতা বিবি উপলব্ধি করলেও দু'মুঠো অন্নই এখন তাদের কাছে মানুষ হবার মূলমন্ত্র।

পৃথিবীর সকল দরিদ্র মানুষের প্রতিনিধিরূপে গল্পকার 'মানুষ' গল্পটিতে অসহায় হতদরিদ্র রাজ্জাকের পরিবারকে চিত্রিত করেছেন। রাজ্জাক ও তার পরিবারের একবিন্দু ভাতের ফেন কপালে জুটে না, মাছ-ভাত তো দূরের কথা। ছয় ও তিন বছরের দুটো ভাইয়ের জন্য তাদের এগারো বছরের বড় বোনটি যখন খাবার জুটাতে অক্ষম, তখন তারা ক্ষুধার তাড়নায় কুকুর ও শকুনের সঙ্গে মরা গরুর মাংস মুখে পুড়ে -

> "রাজ্জাকের চোখে পড়ে তিন বছরের বাচ্চাটার দিকে, মুখটা বন্ধ করে রয়েছে। ... ছেলেটা হাঁ করে না। ছুটে পালাতে যাচ্ছিল। রাজ্জাক তাকে ধরে ফেলে। কেঁদে ফেলে বাচ্চাটা। জলভরা চোখে মিনতি করে মেয়েটা, বাবা, আমাদের খুব ক্ষিধে পেয়েছিল। সমস্ত দিন হেঁটেও আমরা কিছু খেতে পাইনি। আমাদের খুব ক্ষিধে পেয়েছিল বাবা। আমাদের মেরো না বাবা, দোহাই তোমার! শক্ত হাতের চড় খেয়ে ছেলেটা চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। মুখ থেকে খসে পড়ে এক টুকরো মাংস।"[৭]

গল্পের কাঠামোয় ধরা পড়ে উমেশ দাসের বাপের পিসি, রহিম শেখের স্ত্রীর গল্প। দেখা যায় যে সমাজের অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি হতদরিদ্র মানুষের পাশে না দাঁড়িয়ে ধর্মের নামে তাদেরকে হেনস্থা করতে দ্বিধাবোধ করে না। সমাজে উচ্চশ্রেণির কোন ব্যক্তি চুরি করলে তার অপরাধ হয় না কিন্তু চৌধুরী বাড়ির কাছ থেকে ভাগে আনা মুরগির বাচ্চাটিকে শেয়াল ধরে নিয়ে যাওয়ায় পরিশেষে পাতার ভাগ্যে জোটে চোর বদনাম। পাতা মুরগিটিকে এনেছিল এই ভেবে যে মুরগিটি বড় হলে যখন দশটি বাচ্চা দেবে তখন পাঁচটা বাচ্চা তার আর বাকি পাঁচটা চৌধুরী বুড়ির। কিন্তু চুরির অপবাদে তার ভিতর দু:খ হলেও বড়লোকের বিরুদ্ধে সে ভয়ে কিছু বলে নি। তবে চুরি যে তারা একেবারে করে না, তা নয়। যেমন, ক্ষিরা, ঝিঙে, রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা বাঁশ। রাজ্জাক বোঝে এই পৃথিবীটা শুধু বড়লোকের দুনিয়া। যারা বড়লোক তারা ভালোমন্দ খেয়ে বাঁচতে পারবে আর যারা গরীব তাদের ভাগ্যে ফেন পর্যন্ত জোটে না। যখন চৌধুরি বাড়ির কুকুরটা ভালো ভালো খেতে পায় তখন রাজ্জাক ভাবে কুকুর হয়ে জন্মালেই ভালো ছিল। তার শুধুই মনে হতো ঈশ্বরের সৃষ্টি যদি সমান হয় তাহলে হতদরিদ্র পরিবারটি আজ অসহায় কেন। কেউ সাহায্য করে না তাদের। সেদিন চৌধুরী বাবুর ছেলের 'আকিকাতে' অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের সমাবেশে দারোয়ান রাজ্জাককে ভিতরে প্রবেশ করতে দেয়নি কারণ সে দরিদ্র। পরে দেখা যায় অসংখ্য খাবার-দাবার এরা নালায় ফেলে দিয়েছে, তুলে খাচ্ছিল কাক-শকুন, কুকুর-বিড়াল। তবু এরা হতদরিদ্র মানুষদের খেতে দেয়নি।

মানুষ শব্দটার প্রতি পাতা বিবির ক্ষোভ। রাজ্জাক জানে গরীব মানুষকে কেউ সাহায্য করতে চায় না শুধু দক্ষিণা দিলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। সে শুনেছিল,

> "টাকা না থাকলে বেহেশ্‌তেও যাওয়া যায় না! সেদিন ইদের নামাজে চৌধুরি মোল্লাসাহেবকে দশটাকা লিল্লাহ্ দিল। মোল্লাসাহেব দোয়া করল, চৌধুরির জন্যে আল্লাহ্ যেন পরকালে একটা খুবসুরত বালাখানা তৈরি করেন এবং এইকালে যেন চৌধুরির ধনের পাহাড় হয়।"[৮]

পাশের বাড়ির মুরগিটিকে দেখে রাজ্জাক ভাবে সে প্রত্যহ দুটো ডিম খেতে পারলে সুস্থ হত। পাতা বিবিও তা বুঝতে পারে। সেদিন এক বাড়িতে ভিক্ষে করতে গেলে তাদের তিন ভাই-বোনকে একটি ডিম খেতে দেয়। পাতা তা বিক্রি করে কোলের ছেলেটির জন্য চিনি আনে। কর্তব্য সম্পর্কে অবগত করানোর জন্য ছয় বছরের ছেলেটি তার মাকে বলে, 'তুমি ওটা বিক্রি করে কেন ওর জন্য চিনি আনবে? আমাদের ভুখ নাই'। সে তার মা-বাবাকে তাদের কর্তব্য মনে করিয়ে দেয় মাত্র। অনাহারক্লিষ্ট শিশুদের মরা গরুর মাংস খেতে দেখে রাজ্জাক তার তিন বছরে ছেলেটিকে চড় মারে। রাজ্জাকের 'শক্ত হাতের চড়' শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে ধরা পড়ে 'মানুষ' গল্পের উপসংহার।

বরাকের মহিলা গল্পকারদের মধ্যে অন্যতম একজন কৃষ্ণা মিশ্র ভট্টাচার্য। 'শতক্রতু' পত্রিকার হাত ধরে তাঁর যাত্রা। কৃষ্ণা মিশ্র জন্মগ্রহণ করেন কলকাতায় ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ২৯ সেপ্টেম্বর। আসামের হাইলাকান্দি, শিলচর, গৌহাটি শহরে তার পড়াশোনা ও বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। তাঁর গল্পে আধুনিকতা ছাঁচ লক্ষ করা যায়। 'সাপ শিশির খায়' কৃষ্ণা মিশ্র ভট্টাচার্যের একমাত্র গল্পগ্রন্থ। তিনি 'আর্জব', 'অবিধা' ইত্যাদি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। বর্তমানে তিনি দিল্লি নিবাসী।

কৃষ্ণা মিশ্র ভট্টাচার্যের এক অন্যতম গল্প 'ইত্বরবানু এবং মাসমিডিয়া' (২০০৫)। গল্পটির মুখ্য চরিত্র ইত্বরবানু। একটি অসহায় দেশত্যাগী মেয়ে বাল্যকালে তার মার হাত ধরে বাংলাদেশ থেকে ভারতবর্ষে চলে আসার পর তার মা তাকে ছেড়ে চলে যায়। তখন থেকেই সেই অসহায় মেয়েটি শারীরিক শোষণের শিকার হয়। পুরুষতন্ত্রের লোলুপ দৃষ্টির উপহারস্বরূপ ইত্বরবানু যৌন ব্যবসায় ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ে। গল্পে দেখা যায় -

> "...জুলজুলে লোভী শেয়াল চোখ গিলে খায় ইত্বরবানুর তেরো বছরের অপুষ্ট শরীল!"[৯]

গল্পটির শুরুতে দেখা যায় তার মা তেরো বছরের ইত্বরবানুকে ভারতের রাজধানী দিল্লি শহরের রাস্তায় ফেলে চলে যায়। সেই সময় বাংলাদেশে ধর্মীয় অত্যাচারে বিধ্বস্ত ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে নিজের ভিটেমাটি পরিত্যাগ করে নিরাপত্তার জন্য এ দেশে পাড়ি দেয়। কিন্তু ইত্বরবানুর মত মেয়েরা এদেশে এসেও শেষ রক্ষা পায়নি। খাবারের সংস্থান ও প্রাণ বাঁচানোর জন্য নিজের শরীর শেষপর্যন্ত দিতে হয়েছিল ইত্বরবানুকে। সেখানে যৌন ব্যবসায় হয়তো তার নাম কখনো 'রাত কি রানি', কখনো বা 'চামেলি' আর কখনো 'দিলখুশ', 'দিলবাহার', 'দিল কি রানি'।

মিডিয়ার লোকেরা ইত্বরবানুকে নিয়ে সংবাদ করতে চায়। যে মেয়েটি দেশত্যাগী হয়ে রাস্তায় বেড়ে উঠেছে ও নানান লোলুপদৃষ্টির শিকার হয়েছে, মিডিয়ার লোকেরা কিন্তু তাদের সুস্থ জীবনের কথা ভাবে না। তারা চায় যে কোন উপায়ে সংবাদ মাধ্যমে অর্থ উপার্জন। যদি এরা ভাবতো তাহলে ইত্বরবানুর মতো মেয়েদের যৌনপল্লীতে দেহব্যবসা করতে হতো না।

অনেকেই ইত্বরবানুর রাতের সঙ্গী হয়েছে কিন্তু তার স্থায়ী ঠিকানা কোনোদিনও হয়ে ওঠেনি। শরীর ব্যবসা ছাড়া তার বাঁচার কোন অবলম্বন নেই। যখন ইত্বরবানু সন্তানপ্রসবা তখন -

> "অন্ধকার জঠর থেকে রক্তক্লেদমাখা মানবশিশু পৃথিবীর আলোয় সটান। রাজবালা মৌসির মুখ অন্ধকার।"[১০]

অবশেষে সকল মায়া ত্যাগ করে এক মাসের সন্তানকে ইত্বরবানু অনাথ আশ্রমে রেখে আসে। এদিকে পুত্রের পরিবর্তে কন্যাসন্তান জন্মালে রাজবালা মৌসির যত্ন বেড়ে যায়। কারণ কন্যা সন্তান হলে শরীর ব্যবসা করতে পারবে। মৌসির মুখে পুত্র সন্তান নিয়ে ক্ষোভ,

> " 'লেড়কা! কুছ কাম কা নেহি। স্মাগলার নেহি তো চৌকিদার! ক্যায়া ফায়দা? হাঁ, লেড়কি হোতি তো অউর বাত থি'।"[১১]

তাতেই বোঝা যায় মেয়েরা চিরকালই হেনস্থার শিকার, তাদের দেখা হয় শুধু পুরুষের যৌন ভোগের সামগ্রী হিসাবে।

গল্পটিতে আছে দেশত্যাগী ইত্বরবানুর যৌবন থেকে বৃদ্ধের কাহিনি। গল্পের পরিধি স্বল্প কিন্তু তার মধ্যে গল্পকার নিজস্ব শৈল্পিক দক্ষতায় সমাজের বাস্তব সত্যকে চিত্রিত করেছেন। গল্পকার দেখিয়েছেন একটি মেয়ে কীভাবে সমাজে মাথা উঁচু বাঁচতে পারে না তাকে পদে পদে অপমানে বিধ্বস্ত হতে হয়। কাহিনির শুরুতে দেখা যায় শীতে কাতরতা ইত্বরবানু আলস্যতা থেকে রেহাই পেতে 'কোহরে'র (কুয়াশায়) ভেজা ডালপালায় আগুন ধরাতে চেষ্টা করে। ভেজা

থাকার দরুন তাতে সহজে আগুন ধরতে চায় না। ধোঁয়া থেকে যতটুকু তাপ আসে তাতেই সে শীত নিবারণ করার চেষ্টা করে। কয়েকটি ছোট ছোট আগুনের হল্কা এদিকে-ওদিকে ছিটকে পড়ে। শরীর গরম করার জন্য ইত্বর বাল্যকালের খেলার মত বিড়িতে ফুক দেয়। প্রচন্ড ঠান্ডায় তার শরীরে শীত বস্ত্র নেই।

> "নিম্নাঙ্গ থেকে ইজের খুলে যায় বারবার। ইত্বর চেপে চেপে ধরে বারবার। উর্ধ্বাঙ্গে খাটো বেলাউস! পিঁচুটি পড়া চোখে ভোরের কুয়াশা। রুখু পিঙ্গল জটপাকানো চুলে ময়লা, উকুন। ভ্যালভ্যালে তাকায়! টাপুস-টুপুস পানিভরা চোখের কোল। লন্ডভন্ড ছত্রাকার ঝোপড়ির সামনে ইত্বরবানু দাঁড়িয়ে। হাত দিয়ে চোখের জল মুছতে গেলে ইলাসটিকহীন ইজের খুলে খুলে যায়; জুলজুলে লোভী শেয়াল গিলে খায় ইত্বরবানুর তেরো বছরের অপুষ্ট শরীল! গতর! ইত্বরবানু তাই ইজেরের খুঁট চেপে ধরে স্বভাবজাত লজ্জায়। চোখের পানি চোখ ছাড়িয়ে চিবুক, গলা, বুকের খাঁজ বেয়ে নাভিকুন্ডে জমা হয়।"[১২]

তেরো বছরের ইত্বরবানুকে মিডিয়ার লোকেরা বলতে বাধ্য হয় -

> "বাট্ দ্য গার্ল ইজ্ রিয়্যালি ফ্যানটাস্টিক। পারটিকুলারলি দোজ্ আইজ! লাভ্লী।"[১৩]

বাণিজ্যিক-চ্যানেলে ইত্বরবানুর সংবাদ কখনো ডিনারটেবিলের গরম স্যুপের বাটিতে, কখনো বা পনির কোপ্তায় বা নাগরিক অন্দরমহলে, অফিসে কিংবা হোটেলের রিসেপ্শনে।

ইত্বরবানু রামদীন রিক্সাওয়ালার দ্বারা ধর্ষিতা হয়। 'ঝোপড়ির অন্ধকারে কুণ্ডলি পাকানো সরীসৃপের মতো' দেশি বোতলের সাথে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। তার ঠোঁটের কোনে রক্ত 'দ্রোণীদেশ' বেয়ে পায়ের গোড়ালি অব্দি রক্তস্রোত। 'আম্মিরে-মোক ফালাই কনে গেলি?' তার মধ্য দিয়ে ইত্বরের আর্তনাদ প্রকাশ পায়। সময়ের সাথে সাথে ইত্বরবানু নিজেকে বদলে ফেলার চেষ্টা করে। শরীরে আরবি ইত্বরের খুশবু, চোখে কালো সুর্মা, চুলে জরির বিনুনি। ভোটদান করে নাগরিক কর্তব্য সম্পাদন করে সে। এরই মধ্যে এক পুত্র সন্তান প্রসব করে ইত্বর কিন্তু সামাজিকতার চাপে পুত্রকে অনাথ আশ্রমে দিয়ে আসে। জীবনের সায়াহ্নে এসে তার পুনরায় আশ্রয় হয় রাস্তায়, ফুটপাতে কিংবা অফিস আদালতের বারান্দায়। এখন 'ইত্বরবানুদের জন্য তা-ই সরকারি রাতের আশ্রয়'। রাতের অন্ধকারে ইত্বরবানু নিজের বৃদ্ধ দেহকে ঢেকে ফেলার চেষ্টা করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ বার্ধক্যেও তার রেহাই নেই। শীতনিদ্রায় আচ্ছন্ন বৃদ্ধ ইত্বর কম্বল জড়িয়ে দেখে -

> "কম্বলের তলায় মরদ সাপ না মানুষ! ইত্বরবানুর শুকনো ওমহীন শরীরে সরীসৃপ মরদ ঘোরাফেরা করে। ইত্বরবানু হাঁপায়। ইত্বরবানু জানে যতক্ষণ ইত্বরবানুর হৃদপিণ্ড ধুকপুক করবে, ততক্ষণ সরীসৃপ মরদও কিলবিল করে হেঁটে বেড়াবে। ইত্বরবানু হাঁফায়! বুকে দমচাপা কষ্ট।"[১৪]

ইত্বরবানুর মতো মেয়েরা শেষজীবনেও নিজেকে পুরুষতন্ত্রের শিকল থেকে রেহাই করতে পারে না। এরা বাধ্য হয়ে সভ্য সমাজ থেকে নিজেদের দূরে ঠেলে দেয়। মিডিয়া খবর প্রচার করে ঠিকই কিন্তু সেই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় না। দেখা যায় বর্তমান আধুনিক সভ্য সমাজে অনেক শতশত মহিলা ধর্ষণকারীদের দ্বারা ধর্ষিতা হচ্ছে। ঘরে-বাহিরে, বাসে-ট্রামে এমনকী কর্মক্ষেত্রেও মেয়েদের রেহাই নেই। আমাদের টালমাটাল সমাজ ব্যবস্থায় মহিলাদের কোন অস্তিত্ব নেই। ইত্বরবানু পরিচয় মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার হলেও কোনো নারী সংগঠন ও তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেনি। সমাজের অবহেলিত, আশ্রয়হীন, হেনস্থার শিকার ইত্বরবানু সমাজের সকল স্তরের নারীর প্রতিনিধি হয়ে আমাদের সামনে ধরা দেয়।

Reference :

১. মাশুক আহমেদ (সম্পাদক); বরাকের গল্পসংগ্রহ (প্রথম খন্ড); জানুয়ারি,২০১১; বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, বনমালী রোড, করিমগঞ্জ; আসাম-৭৮৮৭১০; পৃ, ১৯

২। তদেব; পৃ. ২১

৩. তদেব; পৃ. ২২

৪. তদেব; পৃ. ১৯
৫. তদেব; পৃ. ৫৬
৬. তদেব; পৃ. ৫৭
৭. তদেব; পৃ. ৬১
৮. তদেব; পৃ. ৫৯
৯. তদেব; পৃ. ১২৬
১০. তদেব; পৃ. ১২৮
১১. তদেব; পৃ. ১২৮
১২. তদেব; পৃ. ১২৬
১৩. তদেব; পৃ. ১২৭
১৪. তদেব; পৃ. ১২৯